বাংলা নাটকের শ্রেণীচরিত্র বদলে বিজনের ভূমিকা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজন ভট্টাচার্যর—সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই প্রায় চার দশকের নানা স্মৃতি এসে এক সঙ্গে ভিড় করে। ত্রিশের দশকের শেষার্ধে সুঠামদেহ এক উজ্জ্বল যুবক 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' যোগ দিল, সহকারী সম্পাদক রূপে। শুনলাম তখনকার 'আনন্দবাজার' সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পর্কে সে ভাগ্নে। সত্যেনদাকে কেন্দ্র করে 'আনন্দবাজার'-এ আমাদের যে মধুচক্রটি গড়ে উঠেছিল তাতে ছিলেন কবি অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল প্রভৃতি। পরে এসে যোগ দিল গঙ্গাপদ বসু ও সুবোধ ঘোষ। বিজন এসে সেই চক্রে গুলজার বাড়াল। সবাই বলত আমাদের—সুখী পরিবার।

'আনন্দবাজার'-এ আসতেন তখন নবীন প্রবীণ প্রগতিশীল লেখকরা। আড্ডা হত, মৌতাত জমত—বেরসিকদের স্থান ছিল না সেখানে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সরোজ দত্ত ও নন্দগোপাল সেন এলে হাসির বন্যা বয়ে যেত। কৌতুকের অন্ত ছিল না। কিন্তু সব কিছুতে ছিল সাহিত্যের একটা আমেজ। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা।

বিজনের মাথায় নাটক লেখার চিন্তা তখনো আসেই নি। হালকা ধরনের দু-একটা গল্প লিখত। সত্যেনদা 'আনন্দবাজার' ছাড়ার পরে আড্ডাটা চলে গেল প্রধানত 'অরণি' অফিসে। বিজন লিখতে লাগল 'অরণি'তে। ১৯৪৩-এর আগে নাটক লেখার কথা সে ভাবেই নি। বলত, তার হাতে নাটক আসবেই না; কারণ নাটক কিভাবে লিখতে হয় সে জানে না। বিজন ভাবতেই পারে নি যে একদিন তার হাত থেকেই নাটক বেরিয়ে বাংলা নাট্যের ক্ষেত্রে ল্যাণ্ডমার্ক সৃষ্টি করবে।

'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র মধ্য দিয়ে যখন তার সেই নাট্যসত্তার অভ্যুদয় ঘটল, বিজন যেন তখন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারল। বুঝল যে নাটকেই হবে তার যথার্থ বিকাশ। গান জানত, গল্প লিখত। কিন্তু তার সেসব গুণ হয়ে গেল আনুষঙ্গিক। নাটক লেখা, অভিনয় করা, অভিনয় শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতিই হল তার প্রধান অবলম্বন। এক কথায় তখন থেকে তার মঞ্চগত প্রাণ। এসব সে শেখেনি কারো কাছে—সবই সহজাত গুণ। বিজন বলত, ছেলেবেলায় বাবার কাছে তার শেকস্পীয়র শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বাঙলায় তর্জমা করে শেকস্পীয়রের নাটক থেকে কোনো কোনো অংশ তাকে বুঝিয়ে দিতেন। পরবর্তী জীবনে সেটা প্রেরণা হয়ে থাকলেও বিজনের নাটকে শেকস্পীয়রের কোনো প্রভাবই নেই। কেবল শেকস্পীয়র কেন, কোনো বিদেশী নাট্যকার বা এদেশের পূর্বসূরীদের কোনো রূপ প্রভাবও বিজনের নাটকে দেখা যায় না। কাঁচা মাল নিয়ে কাঁচা হাতেই সে নিজের মতো করে নাটক লিখতে আরম্ভ করে। সে জন্যেই তার নাটকের উপাদান যেমন আনকোরা, তেমনি তার গঠনও অভিনব। নাট্য ব্যাকরণের সঙ্গে মেলে না, অথচ তার নাট্য-অবয়বের

শিল্পসৌকর্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজন নাটকের কাঠামো ধরে জীবনের দিকে এগোয় নি, জীবন থেকে নাটকের দিকে এগিয়েছে। নাটক কতটা হল না হল সেদিকে বেশি নজর না রেখে সে চাইল জীবনকে যতটা সম্ভব নাটকে তুলে ধরতে। বিজন যদি নাটকের কাঠামো ভেঙে থাকে তবে তা করেছে সে হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে, যে জীবনকে সে আনতে চেয়েছে মঞ্চে সেই জীবনই তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছে—তারা পুরনো কাঠামোতে আসতে চায়নি। অন্নবস্ত্রহীন হতভাগ্য মানুষগুলি ধরাবাঁধা ফ্রেম ভেঙে দিয়ে নিজেদের মতো করে পটভূমি রচনা করেছে আর সেখানে দাঁড়িয়ে তারা হেসেছে, কেঁদেছে, নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলেছে। মঞ্চের সত্য চলে গেছে জীবনের সত্যের কাছে; জীবনের সত্য মঞ্চে এসে সংকুচিত বা কুণ্ঠিত হয় নি। মঞ্চসত্য ও জীবন-সত্যের মধ্যে এই সেতুবন্ধ রচনায়ই বিজনের কৃতিত্ব ও অনন্যতা। এই জীবননিষ্ঠা ছিল বলেই নাট্যপথে পদক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিজনের অসামান্য সাফল্য ও ঈর্ষা করার মতো খ্যাতি।

যাত্রার শুরুতেই বিজন যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পায়, যে কোনো নাট্যকারের পক্ষেই সেটা সৌভাগ্যের বিষয়। যারা ভাগ্যান্বেষী ও অর্থলিপ্সু তারা সেটাকেই পুঁজি করে শিল্পকে পণ্য হিসেবে বাজারে চালু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তাদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য বা প্রত্যয় বলতে যা বোঝায় তা থাকে না। অর্থের বিনিময়ে কুরুচিপূর্ণ বেসাতি ছাড়তেও তাদের আটকায় না। বিজন তা করে নি, বা করতে পারে নি। যে অঙ্গীকার ও যাদের প্রতি আনুগত্য নিয়ে সে নাট্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে বা সেই আনুগত্য থেকে সরে যেতে তার বিবেকে আটকাত। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অঙ্গীকারবদ্ধ থেকেই সে তার দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করে গেছে।

বিজন সর্বদাই নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করত। সে দায় কি? তা বুঝতে হলে তার জীবিতকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবন করা দরকার। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে মানবমুক্তির সংগ্রামের অংশীদার হবার যে দায় বিশ্বের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা স্বীকার করে নেন এবং নিজেদের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নেন সে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ভার—বিজনের ছিল সেই দায়বোধ। সমকালীন ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাই সে তার সাধ্য মতো পালন করেছে।

সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হলে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে যে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা জানা দরকার। কারো বা কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারেই যে এত বড় একটা সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এমন নয়; ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তা জন্ম নিয়েছিল। যাঁরা তাকে রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলেই উত্তরসূরীদের কাছে স্মরণীয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব বিশের দশকেই কিছু কিছু পড়তে থাকে যার ফলে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবী মহলে একটা নতুন জীবনবোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। একদিকে যেমন বামপন্থী আন্দোলন দানা

বাঁধতে থাকে, তেমনি জাতীয়তাবাদী নেতাদেরও কেউ কেউ অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৭ সালে ব্রুসেল্‌স্‌-এ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা লীগের কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর যোগদান এবং সেখান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোভিয়েত দেশ থেকে ফিরে নেহরু সে দেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হন যার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে ও তাঁর আত্মজীবনীতে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ ও সেই অভিজ্ঞতায় লেখা তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। অক্টোবর বিপ্লবের সারমর্ম বোঝা ও সেই বিপ্লবের দেশটিকে জানার জন্যে ঔৎসুক্য বাড়ে। বলা বাহুল্য, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এর ফলে বস্তুগত ও গুণগত পরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয় মুক্তি চেতনার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা।

ত্রিশের দশকে জাতীয় জীবনে এই বস্তুগত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অধিকতর সংগঠিত হয়ে যেমন শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামী করে তোলে, তেমনি গঠিত হয় এই দশকে সারা ভারত কিষাণ সভা, ছাত্র ফেডারেশন এবং প্রগতি লেখক সংঘ। সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ দেশীয় করদ রাজ্যগুলিতে শুরু হয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রজা আন্দোলন। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে যায়।

এই সময়েই ইউরোপে দেখা দেয় ফ্যাসিবাদের কালোমেঘ। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত বাহিনী করে আবিসিনীয়া (বর্তমানে ইথিওপিয়া) আক্রমণ, জাপানের ফ্যাসিস্ত শাসকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় চীন, স্পেনে পপুলার ফ্রন্টের প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয় ফ্যাসিস্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধাবার আগে এগুলো ছিল ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির মহড়া।

পর পর এই ঘটনাগুলি আন্তর্জাতিক বোধ সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন করে তোলে যাঁদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুও এই অশুভ শক্তির অভ্যুত্থান দেখে বিচলিত হন এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। অবশেষে হিটলারের ফ্যাসিস্ত বাহিনী যেদিন বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ও দুনিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের একমাত্র ভরসা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে, সেদিন এদেশের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের শিল্পকর্মকে হাতিয়ার করে নেন। আন্তর্জাতিকতাবোধ থেকেই তাঁরা উপলব্ধি করেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন ও ফ্যাসিস্ত শক্তির জয় হলে নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামও দুর্বল হয়ে স্বাধীনতা লাভের পথ আরো কন্টকিত হবে। তাই প্রগতি লেখক সংঘকে রূপান্তরিত করা হল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে—সঙ্গীতে,

নাটকে, নৃত্যে, কাব্যে, গল্প-উপন্যাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। এ রাজ্যে গণনাট্য সংঘের জন্ম সেই ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেরই গর্ভে। তাঁরা নিলেন সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও আনুষঙ্গিক শিল্পকলার ভার।

এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমি দিতে হল বিজনের শিল্পকর্ম ও তার শিল্প সংগ্রামের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্যে। সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে বিজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝা বা যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। সেদিন সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে সচেতনভাবে আর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও যাঁরা পুরোধা ছিলেন—বিজন তাঁদেরই একজন। বলা বাহুল্য, সেই আন্দোলনই বিজনকে সৃষ্টি করেছে, আবার বিজন তার সৃষ্টি দিয়ে আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে। আন্দোলন ও সংগঠনের প্রেরণা যুগিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী চৈতন্য দিয়ে, বিজন যেটিকে সারাজীবন মনে রেখেছে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছে।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অক্টোবর বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক সত্তার সাঙ্গীকরণ ঘটলেও তার বস্তুগত দিকটা চল্লিশের দশকের আগে পর্যন্ত বাঙলা নাটকে প্রায় অনুপস্থিতই ছিল। যুদ্ধের চাপ, কালোবাজার, নিষ্প্রদীপ, অবশেষে মন্বন্তর বাঙলার ঘাড়ে এসে এমনভাবে চাপল যে এই বাস্তব ঘটনাগুলি এড়িয়ে অন্যদিকে তাকাবার বা অন্য কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা তখন সাধারণ মানুষের ছিল না। এগুলি যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরই কুফল—এ বোধ তীব্র থাকলেও এ থেকে মুক্তির পথ কোথায়, আর সে মুক্তি আনবে কারা...এ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের চেতনা জিজ্ঞাসার স্তর পেরিয়ে তখনো কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হয় নি। সর্বত্র একটা বিষাদ ও হতাশার ভাব। গণনাট্য সংঘের রূপকাররা তখন অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন মানুষের মনের এই হতাশা দূরে করে জীবনে প্রত্যয় এনে দিতে।

গণনাট্য সংঘের মূল চেতনায় ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা। কিন্তু যাঁরা এই সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা দেখলেন দেশপ্রেমের আবেগপূর্ণ যেসব বাঙলা নাটক তাবৎ লেখা হয়েছে, এই জটিল পরিস্থিতিতে সেসব নাটক আর মানুষের মনে দাগ কাটছে না। সুতরাং নাটকে নয়া উপাদান—অর্থাৎ নতুন জীবন—আসা দরকার। তাঁরা বুঝতে পারলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনচিত্তে সাড়া জাগাতে হলে বাঙলা নাটকে সমাজের যে দিকটি অবহেলিত হয়ে আছে—অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সত্তা অন্বিত হয়ে যে বস্তুগত পরিবর্তন হয়েছে—সেই দিকটিকেই তুলে ধরে নাটকের দিগন্ত প্রসারিত করতে হবে। শুধু জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমের কথা বলে আর লোকের মন ভরানো যাবে না, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সত্তাটিকেও আনতে হবে; আর সে সত্তার উপাদান রয়েছে সমাজের যেসব শ্রেণীতে তারাই হবে গণনাট্য সংঘের নাটকের নায়ক-নায়িকা—তারাই উঠে আসবে মঞ্চে নিজেদের কথা বলতে। মঞ্চে শ্রেণী বদল থেকেই হবে বাংলা নাটকের পালা বদল।

তাই বিজন দুঃসাহসে ভর করে তার 'নবান্ন' নাটকে নায়ক করে নিয়ে এল গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষু চাষীদের যারা সাম্রাজ্যবাদের একটি আঘাতে হৃতসর্বস্ব হয়ে কলকাতার

বুকে এসে 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মরছে। তারা ব্যক্তি হয়ে এল না, এল অন্নদাতা চাষীদের প্রতিভূ হয়ে। এ নাটক কেবল দর্শকদের টাটকা অভিজ্ঞতাকেই স্পর্শ করল না, তাঁদের চৈতন্যকেও নাড়া দিল।

বাঙলা নাটকের শ্রেণীচরিত্রের বদল হয়ে গেল। গণনাট্য সংঘের মঞ্চে এল সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও খেটে খাওয়া মানুষ। পটভূমিতে দেখা গেল কারখানা, মাঠ, মধ্যবিত্ত সংসার, দিনমজুরদের আস্তানা। গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্থ্স' নাটক যেমন একদা মস্কো আর্ট থিয়েটারের শ্রেণীবদল করে দিয়েছিল, বিজনের 'নবান্ন'ও তেমনি বাঙলা নাটকের শ্রেণীচরিত্র বদলে দিল। বিজনের এই অনন্যতা ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে।

যে দায়বোধে ও যে অঙ্গীকার নিয়ে বিজন নাট্যপথে যাত্রা শুরু করেছিল তা থেকে সে কোনোদিনই সরে যায় নি। তাই তার কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'জীয়নকন্যা', 'অবরোধ', 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর', 'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী জননী', 'ছায়াপথ', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'চলো সাগরে', 'হাঁসখালির হাঁস' প্রভৃতি নাটক। সেগুলো নিয়ে সে সংগ্রাম করেছে; তার জন্যে তাকে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে; কিন্তু হতাশ বা অবসন্ন হয়ে সে কখনো সংগ্রামবিমুখ হয় নি। আদর্শে দৃঢ় প্রত্যয় ও মানুষের ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাস ছিল বলেই নৈরাশ্য কখনো তাকে গ্রাস করতে পারে নি। নাটকে যে জীবনগুলির সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তাদের সুখদুঃখ ও সংগ্রামের সঙ্গে তার ভাবগত ঐক্য হয়েছিল। সেই মানুষগুলির মধ্যেই সে বেঁচে থাকবে আর চিরদিন তারাই তাকে আপনজন ভেবে স্মরণ করবে।